



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 228 - 234

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসে দেশভাগের প্রেক্ষিতে বদলে যাওয়া এক নারীর জীবন

ড. এমডি. বাবুল হোসেন

সহকারী অধ্যাপক

বিবেকানন্দ কলেজ ঠাকুরপুকুর, কলকাতা

Email ID : hmdbabul@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Jyotirmayee Devi,
Epar Ganga Opar
Ganga, Sutara,
Religion, Harmony,
Untouchability,
Independence,
Conflict.

Abstract

Jyotirmayee Devi's novel 'Epar Ganga Opar Ganga' (1966) depicts the suffering of a woman who was a victim of the partition. The novel is divided into four parts. This novel is the story of the massacre of a Hindu family and the oppression of women in Noakhali, present-day Bangladesh. Sutara Dutta is the main character of this novel. Her entire family is oppressed by the Muslim community. Although she survives, she has to take refuge in the house of her father's colleague, school teacher Tamiz Saheb. Sutara Tamiz's uncle keeps Sutara, who was affected by the riots, as his own daughter, for about eight months and safely delivers her to her brothers in Kolkata. After reaching Kolkata, Sutara begins another struggle. The Hindu society no longer wants to accept her because she was raised in a Muslim home. Even close relatives of the family turn their backs on her. After that, Sutara studies, establishes herself and understands the world and life more clearly. She comes to know about the suffering of countless ordinary women in India as a result of the partition. At the end of the novel, the love of Pramod lights a light of hope in her life. In this way, the distraught Sutara finds the direction to return to the path of light.

Discussion

মেয়েদের স্বনির্ভরতার চেষ্টা জ্যোতির্ময়ী দেবীর (১৮৯৪-১৯৮৮) উপন্যাস কিংবা গল্পের অন্যতম উপজীব্য। তাঁর পাঠকেরা কখনোই আত্মতৃপ্ত অথবা উদাসীন থাকতে পারেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সমাজ ও সংসারকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানতেন, তাছাড়া স্বশ্রেণীর বাইরে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে তাঁর লেখায় মানবিক প্রসারতা এবং ভৌগোলিক বিস্তারের এক আশ্চর্য সমন্বয় দেখা গেছে। সংসারের অন্তঃপুর থেকে মেয়েদেরকে সমাজের বৃহত্তর অংশে তুলে এনেছে লেখিকার কলম। প্রেমে বা মাতৃত্বে মেয়েদের আত্মত্যাগই শেষকথা নয়, এর বাইরেও মেয়েদের যে এক নিজস্ব জীবন আছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখনীতে সেই ছবি স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

“দেশের পরাধীনতা এবং মেয়েদের পরাধীনতা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কাছে একইরকম চেহারা নিয়ে আসে। তাঁর জীবনের সংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় তাঁর নারীবাদী চেতনা, যা হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্য শিল্পকর্মের মূল উপাদান।”^১

‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশের সময় এর নাম ছিল ‘ইতিহাসে স্ত্রী-পর্ব’। কিন্তু এর একবছর পর পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় প্রকাশকের অনুরোধে নামটি পরিবর্তন করে নামকরণ হয়েছিল ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’। সেখানে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল, যেমন গ্রন্থের শুরুতেই ‘সুতারা দত্ত’ নামে একটি আলাদা অধ্যায়, তারপর আদিপর্ব, অনুশাসনপর্ব এবং স্ত্রীপর্ব এইরূপে অধ্যায় বিন্যস্ত হয়। সেক্ষেত্রে অধ্যায় বিন্যাসে কিছু পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। ‘প্রবাসী’তে প্রকাশের সময় যে অধ্যায় বিন্যাস ছিল, যেমন - আদিপর্ব-১৩, অনুশাসন পর্ব-১৪, স্ত্রীপর্ব-২১ থেকে পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে ১৬, ১৭, ২২ অধ্যায় বিশিষ্ট হয়ে পুস্তকাকারে উপন্যাসটি প্রকাশ পায়।^২

১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার পরবর্তী একযুগ সময়পর্ব ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে স্থান পেয়েছে। কলকাতার, নোয়াখালির দাঙ্গার অভিজ্ঞতা বাংলার হিন্দুদের একটা বড় অংশকেই দেশভাগের পক্ষে নিয়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সচ্ছল হিন্দুরা অনেকেই আর সেখানে থাকতে সাহস পাচ্ছিলেন না। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসে এরকমই এক পরিবারের কথা আছে যারা জমি বাড়ি সামান্য টাকায় বিক্রি করে এদেশে চলে আসতে চাইছেন নিজেদের মান সম্মান রক্ষা করার তাগিদে –

“গঙ্গার পারে অনাহারে মরলেও শান্তি। তোমরা অন্তত এই শরীরটা গঙ্গার পারে দাহ করতে পারবা।”^৩

এই সময়পর্বে মধ্যবিত্ত এবং কারিগর শ্রেণীর মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের একটা বড় অংশ কলকাতা ছেড়ে চলে যান, কারণ প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের দিক থেকে আক্রমণের আতঙ্ক ছিল একই সঙ্গে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েও কেউ কেউ দেশ ছাড়ছিলেন। খালি হয়ে যাচ্ছিল বেলঘাটা, এন্টালি, কাশীপুরের মুসলমান বস্তি, দখল হয়ে যাচ্ছিল মুসলমানদের সম্পত্তি জমি জামা দোকান বাড়ি ইত্যাদি। পাল্টে যাচ্ছিল কলকাতা জনবিন্যাস। তাছাড়া বাংলার মুসলিম লীগের নেতারাও প্রায় সকলেই ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। সাহস করে যারা থেকে গিয়েছিলেন, তারাও আটকে পড়েন কয়েকটি অঞ্চলের গণ্ডিতে - পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, মেটিয়ারকুজ, গার্ডেনরিচ। হিন্দু এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে তারা সাহস পাচ্ছিলেন না।^৪

‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ (১৯৬৬) উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ী দেবী ১৯৪৬ এর দাঙ্গা এবং তার পরবর্তী এক যুগ সময়ের নির্মম, বেদনাতুর কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অস্থিরতা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে মূলত হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে ঘিরে, তার মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালিতে পাশাপাশি বসবাস করা এক হিন্দু এবং এক মুসলমান পরিবারের কাহিনির সূত্রধরে গোটা ভারতবর্ষের স্বরূপ সন্ধান করেছেন লেখিকা। উপন্যাসের শুরুতে লেখিকা নোয়াখালির স্কুল পড়ুয়া সুতারা নামের একটি মেয়ের এক সুন্দর জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতিঘেরা এক পরিবেশের মধ্যে যে বড় হয়ে উঠছিল –

“সেই ছোট গ্রামখানি। প্রতিবেশীও অনেক নয়। একদিকে নদী, পদ্মারই একটি ছোট মেয়ে। ছোট শাখা। বাড়ির পেছনের পুকুর দু’টি। একটি মাঝারি বাগান। ফলের ফুলের গাছে মেশানো পৈতৃক ভিটা। কত পুরুষের পদচিহ্ন সেখানে ছিল? সুতারা জানে না। সুতারার বাবা ওই গ্রামের ইস্কুলের একজন মাস্টার।”^৫

স্বাভাবিক ছন্দে প্রকৃতির কোলে এভাবেই সুতারার বেড়ে ওঠা। আর এর পাশাপাশি কলকাতারও একটি ছবি লেখিকা তুলে ধরেছেন, যেখানে সুতারার বড় ভাই কাজ করেন আর ছোট ভাই দুটি দাদার কাছে থেকে পড়াশুনা করে। দিদির শ্বশুরবাড়িও কলকাতায়। নোয়াখালিতে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাসের সুবাদে পরস্পরের আত্মীয়। কোথাও

পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায় কোনো এক অদৃশ্য বন্ধনে, ধর্মের ভেদাভেদ আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না, সুতারাদের বাড়ির কথা লেখিকার কলমে এভাবেই উঠে আসে -

“বাড়িতে দুটো চাকর, একটা গোরুর কাজ করে, একটা বাড়ির কাজ করে। একজনের নাম রহিম, অন্যজনের নাম করিম। অনেকদিনের পুরানো তারা, দশবারো বছর বয়সে কাজে ঢুকেছিলো। এখন বয়স প্রায় ২৩-২৪ বছর হবে। গান গায়, বাঁশি বাজায়। বাড়িতে থাকে, অন্য গাঁয়ের লোক ওরা। বাড়িতে মা'র কাছে খায়। কলাপাতা উলটা করে পেতে বসে বসে অনেক ভাত তরকারি মাছ খায়। মা ছেলে দুটোকে খুব ভালবাসতেন।”^৬

এই রহিমেরই একটি ভাই, যে সাকিনাদের বাড়িতে কাজ করতো। তাছাড়া তাদের দুই পরিবারের মধ্যে যে খুব ভালো বন্ধন ছিল তাও আমরা জানতে পারি -

“সাকিনার বাবা সুতারার বাবার ইস্কুলেরই হেডমাস্টারমশাই। নাম তমিজুদ্দিন সাহেব। সুতারা তাঁকে ‘কাকা সাহেব’ বলতো। সাকিনা আর সে একই মেয়ে - ইস্কুলে পড়তো, তাই থেকে, আর কাছাকাছি বাড়ি, যাওয়া আসাও ছিল, ভাবও ছিল।”^৭

শুধু সুতারা কিংবা সাকিনা নয়, ফতিমা, সোফিয়া, হাসিনা, মেহের রোশন, প্রমুখ মুসলমান ঘরের মেয়েদের সঙ্গে দুর্গা, উষা, বীণা, অলকা এদের সকলেই সকলের স্কুলের সহপাঠী কিংবা প্রতিবেশী খেলার সঙ্গী ছিল। ঝড়ের সময় আম কুড়োনো থেকে শুরু করে, মাছ ধরা সাঁতার কাটা গ্রাম্য জীবনে যা যা শৈশবে ঘটে সবই তারা একসাথে উপভোগ করতো।

একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দাঙ্গার অভিঘাত এক নিমিষে সুতারার জীবনের সমস্ত ছন্দকে ওলোটপালোট করে দিল। একটা সুন্দর পরিবার জীবন এক নিমিষে ধ্বংস হয়ে গেল। চেনা মানুষ অচেনা হয়ে গেল। যে মানুষগুলো তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে ছিল, তারাই রত্নমূর্তি ধরে একনিমেষে চেনা মানুষকে ধ্বংস করে দিল। ধর্মীয় কুসংস্কার আর বিভেদকামী কিছু স্বার্থপর মানুষের সংসর্গে রহিম কিংবা করিম তার মনিবকে হত্যা করতেও পিছপা হলো না। নীড়হারা অসহায় এক পাখির মতো শুধুমাত্র সুতারা এক ভয়ংকর ধ্বংসের মুখ থেকে বেঁচে ফিরল। আশ্রয় পেল তাঁর পিতৃ-বন্ধু কাকা সাহেবের কাছে। যিনি ধর্ম মতে আলাদা। একই সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন মানসিকতার আলাদা আলাদা মানুষকে লেখিকা এভাবেই ধরার চেষ্টা করেছেন। তমিজ সাহেব এবং তাঁর পরিবারের সেবা শুশ্রূষায় সুতারা নতুন জীবন পেল। কিন্তু দাঙ্গার সেই ভয়ংকর রাত্রির অভিজ্ঞতা তাঁর ভেতরের সত্তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। যার ভার সুতারাকে বয়ে বেড়াতে হল সারা জীবন।

‘সুতারা দত্ত’, ‘আদিপর্ব’, ‘স্ট্রীপর্ব’ এবং ‘অনুশাসন পর্ব’ - এই চারটি পর্ব জুড়ে উপন্যাসের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। ‘আদিপর্ব’ জুড়ে রয়েছে দাঙ্গার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা। যার প্রভাব সরাসরি এসে পড়েছে সুতারার পরিবারের উপর। যে দাঙ্গায় সুতারা তাঁর মা, বাবা ও দিদিকে হারিয়েছে। যে দেশভাগের প্রভাব সরাসরি পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর, সাকিনার মায়ের কথাতে তার প্রমাণ মেলে। বাংলাদেশের এক সাধারণ গৃহবধূ তাঁর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে -

“তোমাদের দেশভাগ চাই, ঝগড়া করবে করো। আমাদের মেয়েদের মান-ইজ্জত শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? একি তোমাদের ধর্মে বলে? কোরানে আছে? তোমরা এত সব শিক্ষিত-গাঁয়ের উকিল মোক্তার মাস্টার-কেউ কারকে কিছু বলছো না কেন?-ছিঃ ছিঃ।”^৮

এই প্রশ্ন যেকোনো সুস্থ মানুষের তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোনো ধর্ম মানুষ হত্যার কথা বলে না, সব ধর্মের বাণী শান্তির কথা বলে। অথচ মানুষ ধর্মের অজুহাতে অধর্ম করতে থাকে। বিশেষ করে অসহায় নারীর মান ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। শুধু অল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত লোকেরা ধর্মের মোহে আটকে থেকে অধর্ম করে তাই নয়, অধর্ম করার জন্য তারা নিজের মতো করে যুক্তি সাজিয়ে নেয়। তমিজ সাহেব মেয়েদের মান ইজ্জত ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে গেলে তার উত্তরে তাঁকে শুনতে হয় -

“মেয়েদের নিয়ে কোথায় কে কবে টানাটানি, ছেঁড়াছিড়ি করেনি? কেন ওদের পুরাণ খুলেই দেখো না? রাবণ সীতাহরণ করেনি? আর দ্রৌপদীর কথা? বললাম, সে তো ভালো কাজ করেনি, সবাই তা জানে। তারা বললে, ওসব ধর্ম-কথা রেখে দাও। সব দেশেই এসব আছে। হয়। আমরা জানি।”^{১৬}

যারা এই কথাগুলো বলেছিল, তারা কেউ অশিক্ষিত নয়। এরা ধর্ম-কর্ম করে, কোরান পড়ে। নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। মসজিদে যায়। অথচ বিধর্মী প্রতিবেশীকে হত্যা করতে হাত কাঁপে না, নারীর ইজ্জত হরণ করতে দ্বিধা হয় না। আসলে-

“নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, যুদ্ধ ও দেশভাগের আবশ্যিক শর্ত বলেই ধরা হয়। কারণ, নারী তো রাষ্ট্রসম্পদ। ... ধর্ষণের অত্যাচারের পরও যারা বেঁচে থাকে এবং বাধ্য হয় অব্যবহৃত গর্ভধারণে, সেই সংখ্যার হিসাব পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এছাড়াও গণনার বাইরে আছে সেই সব নারী, যারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।”^{১৭}

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অসংখ্য নারীকে এভাবেই মূল্য চোকাতে হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে নারীকে এভাবেই মূল্য চোকাতে হয়েছে। সুতারাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে তমিজ সাহেবকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। তাঁকে শুনতে হয়েছিল, -

“একটি হিন্দুর মেয়েকে বাড়িতে রেখেছেন, জোর করে মুসলমান ক'রে নেবেন বলে।”^{১৮}

মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বিবেকবান এই মানুষটি এরপরেও সুতারাকে একলা ছেড়ে দেয়নি। কলকাতায় সুতারার ভাইদের কাছে বারবার খবর পাঠিয়েছে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নানা অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করেছে তারা। ভয় একটাই, তাদের বোন মুসলমানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছে, হিন্দু হয়ে মুসলমানের ঘরে আশ্রিতা বোনকে তারা কিভাবে নিজের করে নেবে এই চিন্তা অনেক বড় হয়ে উঠেছে, দাঙ্গা বিধ্বস্ত বোনের মানসিক যন্ত্রণার থেকেও। তমিজ সাহেব মেয়েটিকে কোন সেবাদলের সঙ্গেও কলকাতায় পাঠিয়ে দেননি। নিজে দায়িত্ব নিয়ে, বিপদ হতে পারে জেনেও সুতারাকে নিয়ে কলকাতায় তার দাদাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। যে সম্প্রদায়ের হাতে সুতারার পরিবার নিঃশেষ হয়ে গেল, সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও যে মানবিক উদারতার পরিচয় তমিজ সাহেব স্থাপন করলেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের সব মানুষের ভাবনা-চিন্তা একরকম নয়। অন্ধ মৌলবাদকে তাই কখনো ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা বোধহয় ঠিক নয়।

‘অনুশাসন পর্বে’ সুতারার জীবন শুরু হয়েছে টিকে থাকা, বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কলকাতায় দাদার শ্বশুরবাড়িতে সে আশ্রয় পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছে। কারণ, দাঙ্গাবিধ্বস্ত সুতারা নোয়াখালিতে আশ্রয় পেয়েছিল এক মুসলমান পরিবারে। সমস্যা সেখানেই। আড়ালে তাঁকে নিয়ে নানান কথা সুতারার কানে এসেছে -

“তোদের আক্কেলকে বলি হারি যাই-। এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়েছিল। এক-আধদিন নয়, ছ'মাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়েমানুষের জাত জন্ম থাকে। ... কিছু আর বাকি রইলো না। কি না খেয়েছে। কি করেছে না করেছে কে তার খবর জানে।”^{১৯}

সুতারা কষ্ট পেয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজেকে শক্ত রেখেছে। কলকাতার বাড়িতে তাঁর একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী অমূল্যবাবু। যিনি তার পড়াশুনার খবর জানতে চেয়েছে - “তা তোমার বইপত্র এনেছো কিছু?” দাঙ্গার শিকার সুতারা প্রতিবেশী সাকিনাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে, সাকিনার জামাকাপড় পরতে পেয়েছে এবং তার পরিবারের আন্তরিক ভালবাসার স্পর্শে তার দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়েছে। অমূল্যবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তাই সুতারার চোখ দিয়ে শুধু টপ টপ করে জল পড়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় -

“অমূল্যবাবুর চোখের সামনে বহুবাহিত - বহু আকাঙ্ক্ষিত আসন্ন স্বাধীনতার এক বিভ্রান্ত বেদনাতুর চিত্র ভেসে উঠলো এবং মনে হ'লো সুতরাই যেন দেশ-জননীরই সেই বেদনার একটি রক্তাক্ত প্রতীক।”^{২০}

কলকাতায় পৌঁছানোর পর সুতারা ক্রমশ বুঝলেও তাঁর আত্মীয় পরিজন ভীষণ উদ্বিগ্ন, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে ঠিকই কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। বিভার পিসিমা বলেছে –

“ছুঁড়িকে আনতে বললে কে? থাকতো সেখানেই। যা হয় হতো। যখন ওর কপালে এমন ঘটনা হ'লোই।
আকছার এমন মেয়েরা ওদেশে পড়ে থাকছে। কে আর নিজের ঘর ওদের এনে নোংরা করবে।”^{১৪}

যাকে আদর যত্ন করে বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানোর কথা ছিল এক্ষেত্রে তার ফল হল বিপরীত। সুতারা তথাকথিত সমাজের উচ্চিষ্ট হয়ে উঠলো। সুতারার মতো অসংখ্য মেয়ে এভাবেই বেঁচে থেকেও পরিবার বিচ্যুত হয়েছে দাঙ্গার কবলে পড়ে। লেখিকা সেই সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন এভাবে –

“এই অটল সমাজের মন কোনো অপহৃত লাক্ষিত মর্যাদাচ্যুত মেয়ের দুঃখে কখনও টলেনি। এমনও হতে পারতো সুতারার মা-বাবাও তাকে ঘরে নিতে পারতেন না। এ মহাভারতের অম্বা, রামায়ণের সীতার কাল থেকে চলে আসছে।”^{১৫}

এরপর সুতারার ঠাই হল একটি মিশনারি স্কুলের বোর্ডিংয়ে। তাঁর থাকা খাওয়া পড়াশোনার বন্দোবস্ত হল। সমাজ পরিত্যক্ত সুতারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে এবং সমাজকে আরো জানতে নিজে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলো। আত্মীয় পরিজনের কাছে তাঁর থাকা বারণ। স্কুলের ছুটির সময় বোর্ডিংয়ের অন্য শিক্ষার্থীরা বাড়ি ফিরতে পারলেও তাঁর মতো বিশেষ করে সে বাড়ি ফিরতে পারত না। কারণ তাঁকে নিয়ে কেউ বিড়ম্বনায় পড়তে চায় না। বাড়ির লোকেরা দেখা করতে যায় মাঝেমাঝে। সুতারার মন খারাপ হয়, সব জেনে বুঝেও তাঁর কিছু করার থাকে না। এরমধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটে এক ঐতিহাসিক নিমন্ত্রণ পর্ব। তাঁর বৌদির ননদের বিয়েতে নিমন্ত্রিত সুতারাকে লক্ষ্য করে জনৈক মন্তব্য করেন – “ও বিভার সেই ননদ যে পাকিস্থানে পড়েছিল কতদিন।” একনিমেষে বিয়ে বাড়ির অতিথিদের বিরূপ চাহনি সুতারার দিকে ধেয়ে আসে। তারপর বিয়ে বাড়িতে খেতে বসে তাঁর ভাগ্যে জোটের লাঞ্ছনা আর অপমান। তাঁকে খেতে দেওয়া হয়, একটি পৃথক জায়গায় যেখানে বাকি কোনো অতিথিদের আনাগোনা নেই। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সুতারাকে এইভাবে বসে খেতে দেখে গৃহকর্তা প্রশ্ন করেন –

“এখানে কি? এত সবাই জড়ো হয়েছে? শুভা কি এখানে? না সুতারা! ও! তা সুতারা এখানে বসে একলাটি খাচ্ছে কেন? ওপরে কি মেয়েদের খাওয়ার জায়গা হয়নি এখনও?”^{১৬}

সবাই সবটা জানা সত্ত্বেও কারো কোনো উত্তর নেই। সবাই নীরব।

সুতারা ধরেই নিয়েছে তাঁর জীবন তাঁর একার। রক্তের সম্পর্কে আপনার বলে যাঁদের চেনে, আসলে তারা থেকেও নেই। দীর্ঘ একযুগ ধরে যন্ত্রনা সহ্য করে পড়াশোনা শেষে সুতারা দিল্লির যাজ্ঞসেনী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে ছাত্রছাত্রী নিয়ে একরকম জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। কলেজে পড়ানোর সূত্রে এবং অন্যান্য প্রদেশের সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে সুতারা জেনেছে দাঙ্গার বীভৎসতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিহার, পাঞ্জাব প্রদেশ কিছুই বাদ যায়নি। সেখানেও নারী নির্যাতন হয়েছে, নারীর সম্মানহানি হয়েছে। কিন্তু সেই দাঙ্গার কথা সুতারা চিরকালের মতো মনে রাখেনি। বরং সুতারা মনে রেখেছে তাঁর তমিজ কাকা ও তার পরিবারকে “সেই কদিনে সাকিনার মধুর সখীত্ব, ম্লিষ্ট বন্ধুত্ব সুতারার মন ভরে আছে।” বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি এভাবেই সুতারার সঙ্গে থেকে গেছে সারাজীবন। কর্মক্ষেত্রেও সুতারার সহকর্মী কৌশল্যাবতী তাঁর দুঃখে সমব্যথী হয়েছে। কারণ তিনিও দাঙ্গার শিকার। আসলে দাঙ্গায় মানুষের কতটা সামগ্রিক ক্ষতি হয়েছে, সে বিচারের বাইরে গিয়ে যদি শুধু মেয়েদের কথা বলা হয় তাহলে দেখা যাবে ইতিহাসের পাতায় তার অনেক সাক্ষ্য থেকে গেছে। মহাভারতের দ্রৌপদী তার অন্যতম উদাহরণ। সুতারা সহকর্মীদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা, দেবদর্শন ইত্যাদিতে সঙ্গী হয়েছে। সমাজচ্যুত একজন নারী এভাবে হয়তো একদল নারীর সঙ্গে থেকে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেয়েছে। এত কম বয়সে এত নির্মম বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সুতারার জীবন অতিবাহিত হয়েছে, যা ঔপন্যাসিকের ভাষায় –

“দুঃখ-কষ্ট পেলে বয়স ছাড়া বড় হয়ে যায় মানুষ। সুতারা আজ পৃথিবীর সমবয়সিনী বুঝি।”^{১৭}

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে উপন্যাসটি ১৩৭৩ সালে ‘প্রবাসী’ শারদীয়া সংখ্যায় ‘ইতিহাসে স্ত্রীপর্ব’ নামে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রকাশকের অনুরোধে পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তিত হয়। লেখিকা জানিয়েছেন –

“মহাভারতের পর কোনো দেশের কোনো ইতিহাসের পাতায় ‘স্ত্রীপর্ব’ নামে কোনো পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় আছে কিনা আমার জানা নেই। ...তাই স্ত্রী পর্বের কোনো ইতিহাসই কোথাও নেই।”^{১৮}

উপন্যাসে ‘স্ত্রীপর্ব’ সংযোজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুতারা যে কলেজে চাকরি করে তার নাম ‘যাজ্ঞসেনী’ কলেজ। ‘সীতা’ নয়। ‘মেয়েরা দৃষ্ট হোক দ্রৌপদীর মতো’ এই বার্তা স্পষ্ট করার অভিপ্রায় রয়েছে এখানে। এই পর্বে বহু ভাষা বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে সুতারার সাক্ষাৎ হয়েছে। এদের কেউ পাঞ্জাবি, কেউ ক্ষেত্রী, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বৈশ্য বালিকা শিক্ষায়িত্রী –

“মহাভারত, পুরাণের, রামায়ণের কেকয়, গান্ধার; কৈকেয়ী, গান্ধারীর দেশের কন্যার দল। কালো সুরমা-টানা চোখ, সুন্দর মুখ উজ্জ্বল গৌর রঙের মেয়েরা।”^{১৯}

সুতারা তাঁর বাল্যবন্ধু সাকিনার মতো স্বামী সংসার পায়নি। পেতে চাইলেও উপায় ছিল না। সুতারার নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা তাঁকে পর করে দিলেও সাকিনা পরিবার আপন করে নিতে চেয়েছিল। সাকিনার মা সুতারার উদ্দেশ্যে সাকিনাকে বলেছিল – “এবারে ওকে বলিস আমি ওকে আমার ঘরের জন্যই নিয়ে নেবো...।” আপন করতে চাইলেও সব সময় আপন করা যায় না। পরিস্থিতি তা হতে দেয় না। সুতারার ক্ষেত্রেও তা হয়নি –

“তাই, আমি মা’র কথা দিদির কথা কি করে ভুলবো...।”^{২০}

প্রমোদ সুতারার জীবনে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস বয়ে এনেছে। সুতারা কে নিজের করে নিতে চেয়ে বাড়িতে সেকথা জানিয়েছে – “আমি যদি সুতারাকে বিয়ে করি আপনাদের কি মত?” এই প্রশ্নে তাঁর বাবা সম্মত হলেও অন্যান্য সদস্যরা কিছুতেই মেনে নিতে চাননি। তাঁর মা এই নিয়ে তাঁকে অনেক কথা শুনিয়েছে। এও বলেছে –

“মেম বিয়ে করে এলে আসবে! ঘরে তুলে নেবো, এও অনেকেই করেছে, আমিও করব, কিন্তু -।”^{২১}

শেষপর্যন্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রমোদ সুতারাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। সুতারা প্রমোদের কথায় বিস্মিত “আমি? আমার বিয়ে? সেকথা কেন?” সুতারার অন্ধকার জীবনে এ যেন এক চিলতে আলো। বিশ্বাস করা যায় না সহজে। একটি প্রশ্ন বারবার তার মধ্যে ঘুরেফিরে আসে, প্রমোদ কি তাকে দয়া করছে? নাকি সত্যিই ভালোবাসা। দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিমূঢ় সুতারা – “কিন্তু করুণা? না, তা চাই না। চাই না। প্রমোদের ভালোবাসা, একি সেই ভালোবাসা? নাকি দুঃস্বপ্ন।” “আমি তোমার ভার নিলাম সুতারা, তোমাকে নিলাম” প্রমোদের এই উক্তি সুতারা কে এক অন্য জগতে নিয়ে যায় – “বারো বছরের পর তার জন্য কি এনেছে? আশ্বাস, আশ্রয়, সঙ্গ, প্রেম, মমতা? সে জানে না।” কিন্তু সে এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছে –

“যা ধন নয়, মান নয়, ঐশ্বর্য সম্পদ নয়। তার বিশেষ একটি কোনো নামও নেই বুঝি! মনে হলো, তার পৃথিবীর মতো ভারী দেহটা সহসা হালকা হয়ে গেছে।”^{২২}

পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল সুতারা ভারতবর্ষে দাঙ্গাপীড়িত এক নারী প্রতিনিধি। যারা দেশভাগের যন্ত্রণাই শুধু ভোগ করেছে, দেশভাগের কোনো সুফল পায়নি। আবু ইসহাকের ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসে রমেশ ডাক্তার দেশ ছাড়তে না চাইলে তাঁর স্ত্রী বলেছে –

“সবাই একে একে চলে যাচ্ছে। আর আমরা এখানে জপমালা নিয়ে বসে থাকি আর কি?”^{২৩}



দেশভাগে শুধু একটা দেশ দু'টুকরো হয়নি, বরং ঘটে গেছে এক বিরাট মানব বিপর্যয়। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ভিটেমাটি ছেড়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছে অসংখ্য হিন্দু-শিখ এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে গেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা বুকে নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে বাকি জীবন।

Reference:

১. দ্রষ্টব্য: যশোধরা, বাগচী, নারীমুক্তিবাদী জ্যোতির্ময়ী দেবী, রায়চৌধুরী, সুবীর, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৮
২. তদেব, পৃ. ৩৭১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, করুণা প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৩৪-৩৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, দেশভাগ দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৬০
৫. রায়চৌধুরী, সুবীর, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৯৯
৬. তদেব, পৃ. ৯৯
৭. তদেব, পৃ. ৯৯
৮. তদেব, পৃ. ১০৫
৯. তদেব, পৃ. ১০৫
১০. দ্রষ্টব্য: একান্তরের বাংলাদেশ : নারীর অবস্থান, দেশভাগ ও নারী ভাঙাদেশ নতুন গড়ন, সম্পাদনা- আশিস হীরা, গাঙচিল, আগস্ট - ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৭৬
১১. রায়চৌধুরী, সুবীর, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১২. তদেব, পৃ. ১২০
১৩. তদেব, পৃ. ১২১
১৪. তদেব, পৃ. ১২৫
১৫. তদেব, পৃ. ১২৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৮
১৭. তদেব, পৃ. ১৬০
১৮. দ্রষ্টব্য : 'আমার কথা', রায়চৌধুরী, সুবীর, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
১৯. রায়চৌধুরী, সুবীর, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
২০. তদেব, পৃ. ১৬২
২১. তদেব, পৃ. ১৮১
২২. তদেব, পৃ. ১৮৫-৮৯
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, দেশভাগ দেশত্যাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬